MAI HEE BHARAT

(A registered political party)
ECI Regn. No.56/89/2011/PPS-I

ম্যায় হী ভারত-এর পটভূমিকা

ডঃ সুবোধচন্দ্র রায়
এম.এসসি., পিএইচ.ডি., এলএল.বি.
রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ

ভারত একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত। গণতন্ত্রের শর্ত অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছে মতন দেশ পরিচালিত হওয়ার কথা, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ মানুষ যা চাইবেন সেটাই বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। যদি ভারত নামক দেশটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ভাবা যায় তাহলে এদেশে যা ঘটছে তা অবশ্যই অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছের প্রতিফলন। সুতরাং কোটি কোটি মানুষের অনাহার, অশিক্ষা,

বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, আইনের নামে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা, কিংবা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি, ইত্যাদির বিষয়ে আমরা চুপ করে থাকতে বাধ্য। কারণ, গণতন্ত্রের ধারণাটি সঠিক হলে আমাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া এর কোনও কিছুই ঘটতে পারে না। আমরা জানি যে একটি পরিবারে যেমন সাধারণত অন্নের সংস্থান করেন পিতা, তেমনি এদেশে খাদ্যদ্রব্যের জোগানদার হলেন কৃষিজীবী মানুষ। অর্থাৎ তাঁরাই প্রকৃত অর্থে 'জাতির জনক'। তাই যখন তাঁদেরই দেখা যায় অনাহারে বা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে তখন কি 'গণতান্ত্রিক' ভারতের লজ্জা লুকোবার কোনো জায়গা থাকা উচিত? এই বৈপরীত্যের একটিই মাত্র অর্থ হলো — এদেশে গণতন্ত্রের নামে একটি প্রহসনের পালা অভিনীত হয়ে চলেছে।

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে প্রথমেই আসা যাক দুর্নীতির প্রশ্নে। অনেকেই বলছেন এই অনাচার দূর করতে হবে যে কোনো মূল্যে কারণ এর জন্যেই দেশের অগ্রগতি থমকে আছে। বেআইনি পথে নাকি কয়েক শো লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাইরে পাঠানো হয়েছে যা ফেরৎ আনতে হবে, ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠছে — তাহলে কি ভারতের অধিকাংশ মানুষই অসৎ? নাহলে 'গণতান্ত্রিক' পরিমন্ডলে এ ধরনের একটি ব্যবস্থা চালু থাকে কী করে? এই বিশাল পরিমাণ অর্থ যেহেতু বেআইনিভাবে বিদেশে যায়নি তাই নিশ্চয়ই সেটা আইন মেনেই করা হয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব? এ যেন ফুটো কলসিতে অনবরত জল ঢালা। একটু তলিয়ে দেখলেই এর কারণটাও ওই জলের মতই স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু ফুটো পাত্রটাকে কেউ সারাতে বা সরাতে চাইছি না, তাই জলের অপচয়ও বন্ধ হচ্ছে না। নুন থেকে যেমন নোনতা

স্বাদ দূর করা যায় না তেমনি এদেশকেও দুর্নীতিমুক্ত করা অলীক ভাবনা ছাড়া কিছুই নয়, কারণ অন্যায়ই হল এদেশের ভিত্তি।

এর প্রমাণের জন্য বর্তমান ভারতে যে সমস্ত নিয়মকানুনকে আমরা আইন বলে জানি তার স্বরূপটা একটু বুঝে নিতে হবে। কয়েক শতাব্দী ধরে বৃটিশরা তৎকালীন ভারতবর্ষের মানুষকে শাসন করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশ থেকে অবাধে লুঠপাট চালাবার প্রক্রিয়ায় যাতে বাধা না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। জোর করে কারুর দেহ থেকে রক্ত টানতে হলে দেহটিকে যেমন দড়ি দিয়ে বেঁধে নিশ্চল রাখা জরুরি, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের মানুষকে আটকে রাখা হয়েছিল আইনের বেড়াজালে। এই আইনগুলিই ভারতবাসীকে বৃটিশের দাসত্ব করতে বাধ্য করেছে।

তবু তারই মধ্যে অনেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে নিজেদের জীবন নিজেরাই পরিচালনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা। এর জন্যে অনেকেই বৃটিশ আমলে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয়েছে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শিশু, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে কয়েক হাজার নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে মারতেও হাত কাঁপেনি শাসকের। এর সবই নাকি ঘটেছিল সম্পূর্ণ আইন মোতাবেক যেসব আইন বৃটিশ সরকার চালু করেছিল ভারতীয়দের স্বাধীনতার চেতনাকে পর্যন্ত আমূল উপড়ে ফেলতে।

বলা হয়ে থাকে এবং অজস্র বইতেও লেখা আছে যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট 'ইন্ডিয়া' নামক একটি ভূখন্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে অবাক হবার পালা। দেখা যায় যে সেদিন রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বৃটিশ আইনের মত আরও একটি আইন এদেশে চালু হয়েছিল মাত্র, যার নাম 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৭'। তাহলে কি ওই আইনেই ভারতকে 'স্বাধীন রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল? অনেককেই প্রশ্ন করা হয়েছে যে তাঁদের মধ্যে কেউ এই আইনটি নিজের চোখে দেখেছেন কিনা, যার উত্তরে একজনকেও 'হ্যাঁ' বলতে শোনা যায়নি। অর্থাৎ তাঁরা সবাই খবরের কাগজে পড়ে কিংবা রেডিওতে বা অন্যের মুখে শুনে জেনেছিলেন যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। অথচ ওই আইন অনুসারে ভারত কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়নি, তৎকালীন ভারতবর্ষের বৃটিশ ভূখন্ডে দুটি 'স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন' তৈরি হয়েছিল মাত্র, যার একটির নাম 'ইন্ডিয়া' এবং অন্যটির নাম 'পাকিস্তান'। আগে ইন্ডিয়া ছিল বৃটিশদের একটা কলোনি, তার বদলে যেন কলোনিটিকে দু'টুকরো করে দুটো কলোনি করা হয়েছে, আইনের ভাষায় যার প্রত্যেকটিকে বলা হয়েছিল একটি 'নতুন ডোমিনিয়ন', কিন্তু 'একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন' বলা হয়নি। এর কারণ হল, 'একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন' কথাটি অর্থহীন — ভূখন্ডটি 'স্বাধীন' হলে ওটি কারো 'ডোমিনিয়ন' হতে পারে না, আবার কারো 'ডোমিনিয়ন' হলে ওটি কখনোই 'স্বাধীন' হতে পারে না। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হল, ওই আইনে নতুন ডোমিনিয়নদুটির প্রধান, অর্থাৎ 'গভর্নর জেনারেল'-কে মনোনীত করার ক্ষমতা পর্যন্ত ডোমিনিয়নবাসীদের দেওয়া হয়নি। তিনি স্বাভাবিকভাবেই

নিযুক্ত হয়েছিলেন ব্রিটেনের মহামান্য রাজার আদেশে ঐ একই আইনের পাঁচ নম্বর ধারায়।

ইতিহাস বলছে, ১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকারের নির্দেশে ভারতের বৃটিশ ভূখন্ডে গঠিত হয়েছিল কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। এবং ভুলে গেলে চলবে না যে ওই অ্যাসেম্বলির সদস্যরা কেউই কিন্তু 'ভারতের নাগরিক' ছিলেন না। কারণ 'ভারতের নাগরিক' (Citizen of India) শব্দবন্ধটি সংবিধানেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, যেটি ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে গৃহীত হয়ে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ইন্ডিয়া নামক ডোমিনিয়নটিতে সম্পূর্ণভাবে চালু হয়েছে। যেহেতু সংবিধান চালু হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতবাসীরা সবাই ছিলেন বৃটিশ প্রজা বা বৃটিশ সাবজেক্টস, তাই বৃটিশ সাবজেক্টদের তৈরি সংবিধানের প্রতিটি ধারা-ই শাসকের মর্জিমাফিক হওয়া ছিল অতি আবশ্যিক। সেই সংবিধানই এখন ভারতের সর্বোচ্চ আইন, যা সরিয়ে রেখে, এমনকী প্রয়োজন থাকলেও, স্বাধীন ভারতের নাগরিকরা অন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবেন না। তা করতে গেলেই এদেশের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে বলা হয়েছে যে ভারতের পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করতে পারলেও সংবিধানের কোনো মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে পারবে না। এখানে মনে রাখতে হবে যে, সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে ওই সংবিধানেরই একটি ধারা অনুযায়ী।

এর সোজা মানে এটাই দাঁড়ায় যে, এদেশের মানুষ কীভাবে নিজেদের পরিচালনা করবেন সেটাও ঠিক করে দিয়েছে আমাদের পূর্বতন বৃটিশ প্রভুরা। তাহলে

আমাদের স্বাধীনতাটা কোথায়? ব্যাপারটা আরও পরিস্কারভাবে বোঝার জন্যে একটা উদাহরণের প্রয়োজন। ধরা যাক একটি জমি কেনার সময় মালিক শর্ত দিলেন যে তিনি সেখানে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে দেবেন এবং জমি কেনার পর ক্রেতা ঐ কুঁড়েঘরেই থাকবেন। প্রয়োজন হলে কুঁড়েঘরটির ছোটোখাটো মেরামতি করা গেলেও কখনোই ওটিকে ভেঙে, অর্থাৎ মৌলিক কাঠামোটির পরিবর্তন ঘটিয়ে, পাকা বাড়ি করা চলবে না। এই শর্ত যদি বজায় থাকে তাহলে ক্রেতা তো জমিটি কিনলেনই না যেহেতু তখনও জমিটির উপর আগেকার মালিকের অধিকারই বজায় থাকছে!

ধরে নেওয়া যাক সেই অস্থির সময়ে, এই ভূখন্ড যখন একটা সঙ্কটের মধ্যে চলছিল, তখন এটা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। সেক্ষেত্রে সংবিধানে এমন একটি ধারা থাকাও আবশ্যিক ছিল যে, স্বাধীন হওয়ার পরে প্রয়োজনে ভারতের পার্লামেন্ট সংবিধানটিকে বর্জন করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু তেমনটিও করা হয়নি, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে শাসকের মনের মতো তৈরি করা একটি সংবিধান ভারতের নাগরিকদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চেয়েছিলেন অন্যের শাসন ও শোষণ থেকে দেশের মানুষের মুক্তি, যার প্রথম পর্যায় হিসেবে আবশ্যিক ছিল বৃটিশ আইনগুলিকে বাতিল করা।

কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট, কিংবা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারির পরেও বৃটিশদের তৈরি প্রায় প্রতিটি আইনই বহাল তবিয়তে থেকে গেল এদেশের মাটিতে। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে প্রায় প্রতিটি বৃটিশ আইন নতুন করে বৈধতা লাভ করলো, অর্থাৎ দেহের

দড়ির বাঁধন যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। তাই আজও এদেশ লুণ্ঠিত হচ্ছে আইনের জালে মানুষকে সুকৌশলে জড়িয়ে রেখে। এখনকার হিসেব অনুযায়ী যে কোনও সময়ে এদেশে প্রায় তিন কোটি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন থাকে। ধরা যাক প্রতিটি মামলায় বাদী ও বিবাদী পক্ষ মিলে অন্তত দশজন মানুষ অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে পড়েন। তাহলে সারা দেশে অন্তত তিরিশ কোটি মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা দেশের কথা ভাবার সময় পাবেন কী করে?

আমরা যে এখনও মুক্ত হতে পারিনি তার প্রমাণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বৃটিশ আমলে এদেশের নানা জায়গায় বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতাল, আন্দোলন ইত্যাদি দেখা যেত এবং তা দমন করতে মানুষের ওপর পুলিশি নির্যাতন চলতো। অথচ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরেও সেই জুলুম এতটুকুও কমেনি। কিন্তু এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না। বৃটিশ আমলে পুলিশ ছিল রাজকর্মচারী, তাই ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থবিরোধী সমস্ত আন্দোলন দমন করা ছিল তাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু আমরা যদি স্বাধীনই হয়েছি তাহলে সেইসব 'রাজকর্মচারী'-দের অস্তিত্ব থেকে গেল কী করে? আমরা কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি? গণতন্ত্রের শর্ত অনুযায়ী আমরাই যদি দেশের আইনপ্রণেতা হয়ে থাকি তাহলে নিজেদের তৈরি করা নিয়মকানুন আমরা মাঝে মধ্যেই অমান্য করতে বাধ্য হচ্ছি কেন? এবার এই সব কিছুই তলিয়ে দেখার সময় এসেছে এবং সেটা আমরাই দেখবো, আমরা, যাঁরা এদেশের আপামর মানুষ, আর

‘মানুষ’ ছাড়া যাঁদের অন্য কোনো পরিচয় থাকতেই পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বুঝে নিতে হবে ‘দেশ’ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ কী। যে ভূখন্ডে মানুষের বসবাস আছে একমাত্র তাকেই ‘দেশ’ বলে অভিহিত করা হয়। মানুষ ছাড়া ‘দেশ’ এর অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ ‘মানুষ’ ও ‘দেশ’ শব্দ দু’টি ওতপ্রতো জড়িত। তাই কোনো দেশের উন্নতির অর্থই হবে সেখানে বসবাসকারী মানুষের উন্নতি, কারণ মানুষকে পিছনে ফেলে কোনো দেশ কখনোই এগিয়ে যেতে পারে না। এদেশের অধিকাংশ মানুষ তথাকথিত উন্নতির মাপকাঠিতে আজও অনেক পিছিয়ে বলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই ধারণাটিও ভুল। সমাজে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য তাঁদের সুপরিকল্পিতভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। সমাজ গঠনের সূচনা থেকেই এই বৈষম্যের বীজ পোঁতা হয়েছিল, যাতে নামমাত্র কয়েকজন অধিকাংশ মানুষের পরিশ্রমের ফসল নিজেরা ভোগ করতে পারে। যাঁদের শ্রমের বিকল্প নেই তাঁরা যদি ঐক্যবদ্ধ হন তাহলে সেই গুটিকয়েক লোক বাকিদের ওপর আধিপত্য কায়েম রাখতে পারে না। তাই মানুষের মধ্যে বিভেদের সাহায্যে অনৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের সবদিক থেকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা কখনও সবাই মিলে নিজেদের বিরুদ্ধে চলে আসা আবহমানকালের নিপীড়নকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবার স্পর্ধা পর্যন্ত করেন না। আর এটাই ক্রমাগত চলতে থাকবে যদি গতানুগতিক কিছু বদ্ধমূল ধারণার আমূল পরিবর্তন না ঘটানো হয়, যে পরিবর্তনের চাবিকাঠি কিন্তু মানুষের হাতেই ধরা আছে।

দেশ পাল্টাতে হলে প্রথমেই নিজেকে পাল্টাতে হবে যার জন্যে চাই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। মানুষ ছাড়া যখন দেশ অস্তিত্বহীন, তখন দেশে উদ্‌ভুত যে কোনো পরিস্থিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব মানুষের ওপরেই বর্তায়। যেহেতু 'আমরা' শব্দটি একাধিক 'আমি'-র সমষ্টি, অতএব 'আমি'-ই দেশ। ঠিক সেই কারণে আমিই প্রত্যক্ষভাবে দেশকে সৃষ্টি করেছি। আমি না থাকলে দেশও নেই।

হয়তো কেউ প্রশ্ন করবেন, শুধু এই ভাবনাটুকু অবলম্বন করেই কি দেশের বর্তমান অবস্থার রদবদল করা সম্ভব? এর উত্তর হল — নিশ্চয়ই, কারণ 'আমি' পাল্টে যাওয়ার অর্থই হল 'দেশ' পাল্টানো। এর পরেও কেউ বলতে পারেন যে এই সামান্য ব্যাপারটা যদি এতই শক্তিশালী হয় তাহলে মানুষের দুর্দশা তো অনেক আগেই ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া দেশের উন্নতিও তো হচ্ছে। এদেশ এখন মহাকাশ গবেষণায় পর্যন্ত অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং মানুষেরও অবশ্যই উন্নতি হয়েছে। এই মন্তব্যের প্রসঙ্গে বলা যায় যে সেই উন্নতির ফসল ঘরে তুলছে সামান্য কিছু লোক, অধিকাংশ মানুষই যার ধারে কাছে নেই। অনাহার, অপুষ্টি, আত্মহত্যা, ইত্যাদি আজও তাঁদের নিত্যসঙ্গী। এর সবকিছুর কারণ হল এই যে 'আমিই দেশ' ধারণাটি সমাজে এখনো প্রবেশ করতে পারেনি।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে না শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে। মানুষ জেগে উঠলেই শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সমূহ বিপদের আশঙ্কা। অন্যের শ্রমের ফসল লুঠ করে তৈরি হওয়া যাদের প্রাসাদ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে, তারাই এই ধারণাটিকে

বলবে আকাশকুসুম। কিন্তু এটা আজগুবি কল্পনা তো নয়ই, বরং অত্যন্ত সহজ একটা পদ্ধতি। এই সরল রাস্তাটা যাতে সবার নজর এড়িয়ে যায়, শুরু থেকেই সেই চেষ্টা করা হয়েছে মানুষকে অশিক্ষা ও আর্থিক অনটনের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে। এবার আক্ষরিক অর্থে আমরা সবাই মিলে সেই হারানো রাস্তাটাই খুঁজে বার করবো, কারণ আমরাই যে দেশ !

কোনোরকম তত্ত্বের জটিলতায় না গিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির সাদামাটা বিশ্লেষণ করার জন্য একটা অনুষ্ঠানবাড়ির কথা ভাবা যাক। চতুর্দিক আলোকিত। মহা ধূমধাম করে আনন্দের হৈ হট্টগোলে সবাই মাতোয়ারা। খাওয়াদাওয়া, গান বাজনা চলছে। এমন সময় হঠাৎ কেউ খারাপ অভিসন্ধি নিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। লোকজনের মধ্যে দেখা দিল আতঙ্ক। সবাই বাড়ির বাইরে আসতে চান কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। টেবিল-চেয়ার উল্টে যাচ্ছে, না-দেখতে পেয়ে কেউ কারুর পা মাড়িয়ে দিচ্ছেন, বাচ্চারা ভয়ে চিৎকার করছে, যাকে বলে চরম বিশৃঙ্খলা। এবার প্রশ্ন হল, কীভাবে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে? যাঁরা আলোর বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁদের অনেকেই বলবেন যে এটা ভীষণ কঠিন কাজ, এক কথায় অসম্ভব। অথচ এর সমাধান এক মুহূর্তেই হতে পারে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে। ঠিক তেমনি, মানুষের মনের অন্ধকার দূর না হলে সমস্যারও শেষ হবে না। আমরাও তাই পরস্পরকে চিনতে না পেরে হানাহানিতে জড়িয়ে থাকবো। অবশ্য এমনটা ভাবারও কোনো কারণ নেই যে কেউ ইচ্ছে করে আলো নিভিয়েছে। আসলে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে সামগ্রিক সচেতনতার এই আলো কখনো জ্বালানোই

হয়নি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ স্বাধীন-ভাবনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই আপাত-অসম্ভব কাজটাই এবার আমাদের করতে হবে। আমরাই আলো জ্বালাবো এবং তার সময়ও এসে গেছে।

প্রথমেই এদেশের নামটির প্রসঙ্গে ভাবা যাক। প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশটি ভারতবর্ষ বলে পরিচিত। সিন্ধু সভ্যতার সূত্র ধরে, সিন্‌ধ্‌—হিন্দ্‌—ইন্দাস্‌-এর বুড়ি ছুঁয়ে, বৃটিশ রাজত্বে উচ্চারণের সুবিধের জন্যে নামটি 'ইন্ডিয়া'-তে রূপান্তরিত হয়েছিল পরাধীনতার একটা ক্ষতচিহ্ন হিসেবে। অথচ দেখা যাচ্ছে 'স্বাধীন' হবার পরেও 'ইন্ডিয়া' নামটি থেকে গেল। মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক নামের প্রচলন আছে, কিন্তু একটি দেশের ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়া' ও 'ভারত' এই দুটি নাম থাকা কী করে সম্ভব? দাসত্বের মানসিকতা কীভাবে আজও আমাদের মনে বদ্ধমূল তার একটি প্রমাণ এদেশের ইংরেজি সংবিধানেই জ্বলজ্বল করছে। দেশটির নাম প্রসঙ্গে সেখানে উল্লেখ করা আছে — 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত'; কিন্তু 'ভারত দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া' লেখা হয়নি। অর্থাৎ বৃটিশ প্রভুদের বুঝতে যাতে এতটুকুও অসুবিধে না হয় তাই 'ইন্ডিয়া' শব্দটি প্রথমে রাখা হয়েছে। আমরা যেহেতু স্বাধীন তাই এদেশের নাম হিসেবে 'ভারত'-কেই গ্রহণ করবো, 'ইন্ডিয়া'-কে নয়। অনেকেই 'মহাভারত' পড়েছেন, কিন্তু কেউই 'মহাইন্ডিয়া' পড়েননি। এবার 'ইন্ডিয়া' নামক পরাধীনতার কলঙ্কটি ভারত থেকে চিরদিনের জন্যে মুছে দিতে হবে।

সচেতনতার আলো যেহেতু কখনোই জ্বলেনি তাই আক্ষরিক অর্থে মানুষও স্বাধীনতার স্বাদ পাননি। সমাজ-সৃষ্টির শুরুতেই ক্ষমতা চলে গিয়েছিল রাজার হাতে।

রাজার মুখনিঃসৃত বচনই ছিল আইন, তাঁর কথাই শেষ কথা। অথচ সেই রাজা, যিনি আইনের উৎস, তাঁর 'রাজাত্ব'-ই ছিল সম্পূর্ণ বেআইনি। আগেই বলেছি, আবারও বলছি — আমরা সবকিছু সোজাসাপ্টা বুঝতে চাই, কোনো তত্ত্বের কচকচিতে না গিয়ে। সমাজ গঠনেরও আগেকার মানব ইতিহাসের একটা দিনের উদাহরণ দেওয়া যাক এই প্রসঙ্গে।

শীর্ণ এক নদী বয়ে চলেছে, যার তীরে একটা আমগাছ। একজন মানুষ গাছে উঠে আম পাড়ছেন। একটু দূরে নদীতে মাছ ধরছেন আরেকজন। এমন সময় সেখানে এলেন তৃতীয় এক ব্যক্তি। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর যিনি আম পাড়ছিলেন তাঁকে প্রশ্ন করলেন – আপনি ওটা কী পাড়ছেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলেন — এটা একটা ফল, দারুণ খেতে। চেখে দেখবেন নাকি? আগন্তুক একটা আম নিয়ে খেয়ে দেখলেন, বেশ ভাল। তিনি আমদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবার গেলেন যিনি মাছ ধরছিলেন তাঁর কাছে। একই প্রশ্নের পর তিনি একটি মাছও পেলেন এবং মাছদাতাকেও ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

পরদিন সেই ব্যক্তি আবার হাজির হলেন একজন সঙ্গী নিয়ে। প্রথমে গেলেন আমগাছতলায়। তাঁর সঙ্গীটিও আম খেতে চান শুনে যিনি আম পাড়ছিলেন তিনি আপ্লুত হয়ে দু'জনকেই তৃপ্ত করে নিজে ধন্য হলেন। নদীতে গিয়েও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আগন্তুক কোনো পরিশ্রম না করেই আম ও মাছ দুটোই খেয়ে শরীরে যে শক্তি সঞ্চয় করলেন তা অন্যদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এর কারণ হল, আমপাড়ার বা মাছধরার জন্যে তাঁকে কোনো পরিশ্রমই

করতে হয়নি। এভাবেই তিনি অন্যের শ্রমের ফসল চালাকির সাহায্যে আত্মসাৎ করে নিজে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। ক্রমশ তাঁর প্রতাপ ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ায় মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভয়ের সঞ্চার ঘটলো। আগে যা স্বেচ্ছায় অনুগ্রহ হিসেবে দেওয়া হতো সেটাই এবার বাধ্যতামূলক হয়ে 'তোলা'-য় পরিণত হল এবং তোলা আদায়ের মাধ্যমে ওই আগন্তুক একদিন 'রাজা' হয়ে বসলেন। শুরু হলো প্রজাদের তথাকথিত 'আইনানুগ' শাসন এবং অবধারিত শোষণ করা।

'রাজাত্ব'-র শুরু এভাবেই হয়েছে মেনে নিলে আমরা দেখছি ওই ব্যক্তি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছেন মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ঠকিয়ে। এক কথায়, বেআইনিভাবে। প্রথমদিকে আদায় করা এই তোলা-ই পরে আইনের ভাষায় পরিণত হল রাজস্ব বা ট্যাক্স-এ। কালে কালে ওই তোলা আদায়ের পথটিকে মসৃণ রাখতে বিভিন্ন নীতির প্রচলন করা হয়েছে, যার অন্যতম হল অর্থনীতি, মোটা মোটা কেতাবের দৌলতে যা আজ একেবারে শাস্ত্রের পর্যায়ে উন্নীত। যেহেতু 'জোর যার মুল্লুক তার' নামক আপ্তবাক্যটিই হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র চালিকাশক্তি, তাই রাজা অবশ্যই মহামান্য, তাঁর মুখের কথা অবশ্যই আইন, অনুগত প্রজারা যা মানতে বাধ্য। তাঁরা কিন্তু স্বেচ্ছায় রাজার আনুগত্য স্বীকার করেননি, তাঁদের বাধ্য করা হয়েছে পাইক পেয়াদার লাঠির জোরে। তবু রাজা কিন্তু কখনোই ভুলে যান না যে প্রজা না থাকলে এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর নিজের অস্তিত্ব থাকে না। প্রজাদের মধ্যে এই উপলব্ধি যাতে কিছুতেই না আসে যে তাঁরাই সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং সবাই সমান ও একই পরিবারের

অন্তর্গত, তাই শুরু থেকেই 'প্রজাদের' মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে পারস্পরিক শত্রুতার বীজ বপন করে। ধনী–দরিদ্র, শিক্ষিত–অশিক্ষিত, উঁচু–নিচু ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি সৃষ্টি করে নানা ধরণের কৃত্রিম গোষ্ঠিতে ভাগ করা হয়েছে মানুষকে, প্রকৃতির নিয়মে যার অস্তিত্ব কখনোই ছিল না এবং থাকতেই পারে না। নিজেদের মধ্যে অযথা হানাহানিতে লিপ্ত থাকার ফলে রাজার চতুরতা প্রজাদের চোখে ধরা পড়েনি। রাজতন্ত্র এভাবেই মানবসভ্যতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল।

এই প্রসঙ্গে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে ‘গরীব’ শব্দটিও কৃত্রিম ও অর্থহীন। গরীব অর্থে ধরা হয় এমন একজনকে যাঁর তেমন টাকা পয়সা নেই, যেমন একজন কয়লাখনির শ্রমিক। তিনি জীবনকে আক্ষরিক অর্থে হাতের মুঠোয় নিয়ে প্রতিদিন খনিতে নামেন কয়লা তুলতে। তিনি যদি কয়লা না তুলতেন তাহলে কয়লাচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হত কি? সম্ভব হত কি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিদ্যুৎ, ইস্পাত ইত্যাদি উৎপাদনের ব্যবসা? এই যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তার মূলে কিন্তু সেই কয়লাশ্রমিক। অর্থাৎ তিনিই এর সবকিছুর উৎস। তাহলে তাঁকে আমরা কোন সাহসে গরীব বলে অবহেলা করার স্পর্ধা দেখাই?

এবার আসা যাক ‘অশিক্ষিত’ শব্দটিতে। আমরা তথাকথিত ‘শিক্ষিতরা’ কেমন অনায়াসে একজন কৃষক বা যিনি জুতো তৈরি করেন তাঁর গায়ে ‘অশিক্ষিত’-র তকমা লাগিয়ে থাকি। একবারও আমাদের মনে হয় না যে, আমরা যারা শিক্ষার বড়াই করি, তারা কিন্তু কখনোই নিজেরা ধান রুইতে বা জুতো সেলাই করতে পারি না। আমরাও কি তাহলে অশিক্ষিত নই? সাধারণভাবে তাঁদের

পুঁথিগত শিক্ষা না থাকার কারণ হল এই যে, তাঁরা সেই সুযোগই পাননি। ঠিক যেন জোর করে কারুর পা ভেঙে দিয়ে তাঁকেই আবার 'খোঁড়া' বলে অবজ্ঞা বা করুণা করা।

রাজতন্ত্রের পরে এসেছে তথাকথিত গণতন্ত্র। রাজার ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কয়েকজন ব্যক্তি রাজাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করলেন। তাঁরাও বুঝেছিলেন যে সমস্ত ক্ষমতাই আসলে মানুষের হাতে, তাই জনগণের নামই ব্যবহার করা হল 'গণতন্ত্র' শব্দের মাধ্যমে, যেন জনগণই এবার সরাসরি দেশ নিয়ন্ত্রণ করছেন। 'গণ' শব্দটির সাহায্যে মানুষকে প্রাধান্য দেওয়ার একটা আবহ সৃষ্টি করা হলেও এটাও কিন্তু আসলে পুরোপুরি রাজতন্ত্র, যেখানে ক্ষমতাসীন 'রাজা'র সংখ্যা এক না হয়ে 'মন্ত্রী' শব্দের মাধ্যমে একাধিক হয়েছে মাত্র। যেহেতু রাজার মতো ক্ষমতা ভোগ করতে হলে প্রজাদের দাসত্বের বেড়ি এতটুকুও শিথিল করলে চলে না, সুতরাং তথাকথিত গণতন্ত্রেও রাজতন্ত্রের প্রজা নিপীড়নকারী সমস্ত আইনই বজায় রাখা হয়েছে তোলা আদায়ের পথটি প্রশস্ত রাখতে। এবং সম্পদের জোগানদার হিসেবে জনগণের ভূমিকা একই থেকে গেছে সেই রাজতন্ত্রের আমল থেকেই, স্বাভাবিকভাবেই তার কোনো পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। অতএব, বহুপ্রচারিত 'আমরা সবাই রাজা' কথাটি কবির কষ্টকল্পনা মাত্র, বাস্তবে যার অস্তিত্বই নেই। 'গণতন্ত্রে' বলা হয়েছে জনগণের প্রতিনিধিরা দেশ 'পরিচালনা' করবেন, কিন্তু বাস্তবে যা হচ্ছে তা হলো, রাজনৈতিক দলের নির্ধারিত কয়েকজন দেশ 'শাসন' করছেন। তাই তথাকথিত গণতন্ত্রেও 'শাসকদল' বা 'রুলিং পার্টি' কথাটি আজও

বিদ্যমান। কেউই প্রশ্ন করেন না যে, 'স্বাধীনতা' লাভের পরেও 'শাসক'-এর অস্তিত্ব থাকে কীভাবে; অথবা 'গভর্নমেন্ট' শব্দটিরই বা প্রাসঙ্গিতা কোথায়?

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী নাকি এদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, অথচ যাঁরা নির্বাচনে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' করেন তাঁরা কিন্তু কেউই সঠিক অর্থে জনগণের প্রতিনিধি নন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা থাকেন কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং তাঁদের দায়বদ্ধতা জনগণের চেয়ে দলের কাছেই বেশি। নির্বাচনে যাঁরা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' করেন, ধরে নিতে হবে তাঁরা সবাই দেশের মঙ্গল চান। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিশ্চয়ই বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি থাকে যার সাহায্যে দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারে বলে দলীয় সদস্যদের বিশ্বাস। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে নির্বাচনে 'জেতার' জন্যে এত হিংসার পথ নিতে হয় কেন? কেনই বা 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' করতে হয়? ধরা যাক একটা বাড়ি রঙ করার প্রসঙ্গে কেউ একজন বললেন, সাদা রঙটাই বেশ মানাবে। অন্যজন বললেন, রঙটা গোলাপি করলে ভাল হয়। তৃতীয়জন হয়তো ধূসর রঙের পক্ষপাতী। তাঁরা কিন্তু সবাই আন্তরিকভাবে চাইছেন যাতে বাড়িটা দেখতে সুন্দর হয়। এঁরা যদি কেউ কারুর শত্রু না হন তাহলে রাজনীতির বেলায় সেটা ঘটে না কেন? ঘটে না, কারণ তা হলেই তো মামলা শেষ হয়ে যায় ! তাছাড়া, শোষণের 'স্টেটাস কো' বজায় রাখতে পারস্পরিক শত্রুতা জিইয়ে রাখা যে অত্যন্ত জরুরি ! সুতরাং যতদিন রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না ঘটছে ততদিন দেশের, অর্থাৎ মানুষের, যথাযথ অগ্রগতি অসম্ভব। এর জন্যে প্রথমেই

আমাদের নিজেদের দুর্বলতার উৎসগুলি নির্মূল করতে হবে।

আমরা সবাই ভাবি, এই অচলায়তন আমি একা কীভাবে সচল করবো? প্রথমত, আমরা খেয়াল করছি না যে নিজেরা অচল বলেই দেশটিতে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা চলতে শুরু করলেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয়ত, আমি একা নই। আমার মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ একশো পঁচিশ কোটিরও বেশি 'আমি' মিলে বর্তমানে ভারতের অবস্থান। প্রতিটি 'আমি'-ই একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, ঠিক যেমন অসংখ্য কোটি কোষের এক অকল্পনীয় সংযুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের দেহ। দেহের কোথাও আঘাত লাগলে সমস্ত দেহেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আর সেই আঘাতকে প্রতিহত করতে কোটি কোটি কোষ একসঙ্গে প্রত্যাঘাত করে, ফলে আঘাতকারীর পালাবার পথ থাকে না। এ থেকেই বোঝা যায়, একটিমাত্র কোষের কতখানি শক্তি যখন সে অন্যান্য কোষের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঠিক তেমনি আমরাও প্রত্যেকেই, নিজের অজান্তে, এক একজন বিরাট শক্তির উৎস।

সমস্ত ভারতের মানুষ যখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছবো যে আমরা সবাই একই পরিবারের সদস্য এবং একে অন্যের পরিপূরক, তখনই আমাদের ব্যক্তিচেতনা জেগে উঠবে। আদর্শ পরিবারে যেমন আর যাই থাক দুর্নীতি থাকে না, দেশেও তেমনি দুর্নীতি সৃষ্টির কারণ থাকবে না। পরিবারের কোনো সদস্যের সমস্যা যেমন অন্যরাও ভাগ করে নেন, ঠিক তেমনি এদেশের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো সমস্যা আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিলে দেশে একটিও আনাহারে মৃত্যুর ঘটনা

ঘটবে না। একই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবে মানুষের মনে ঘৃণা, হিংসা বা জিঘাংসা সৃষ্টির সমস্ত কারণ। অন্যদিকে, পৃথিবীতে মানুষের স্থান যদি সবার উপরে হয় তাহলে অর্থের অবস্থান মানুষের নিচে থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু এর উল্টোটাই ঘটছে তাই অর্থকেও আমরা পুনর্মূল্যায়ণ করবো। মানুষের উপরে কোনো কিছুই থাকবে না, এমনকী অর্থও নয়। তেমন একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার নাম দেওয়া যাক ‘গণসত্তা’।

এখানে মনে রাখতে হবে, তথাকথিত 'গণতন্ত্রে' জনগণ শুধুমাত্র 'ভোটার' বা 'নির্বাচকের' ভূমিকা পালন করেন যেখানে জনগণকে 'শাসন' করার ক্ষমতা ওই 'নির্বাচিত' প্রতিনিধিদের কুক্ষিগত হয়। যেন-তেন-প্রকারেণ একবার 'নির্বাচিত' হয়ে যাবার পর 'শাসন' প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে ওই 'জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি'-দের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত, যার আগে তাঁদের সমস্ত বেয়াদবি সহ্য করা ছাড়া জনগণের আর বিশেষ কিছুই করণীয় থাকে না।

গণসত্তায় এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানো হবে। নির্বাচনের পরেও প্রয়োজনে জনগণ যাতে তাঁদের আরও একটি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন সেজন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় একটি উপযুক্ত সংশোধনী আনা হবে যার ফলে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির পদের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে তাঁর নির্বাচকদের সন্তুষ্টির ওপর। অর্থাৎ যতক্ষণ তাঁরা কোনও প্রতিনিধির কাজে সন্তুষ্ট থাকবেন ততক্ষণই তিনি তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন। নির্বাচকরা যখনই প্রয়োজন মনে করবেন তখনই তাঁরা সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন, যা হবে সমস্তরকম

দুর্নীতিকে সমূলে উৎখাত করার প্রথম পদক্ষেপ। এমনকী নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহারের এরকম একটি বৈধ পদ্ধতির অস্তিত্বও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিমুহূর্তে মনে করাবে যে জনগণই বাস্তবিক ও আক্ষরিক অর্থে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার উৎস, তিনি শুধু জনগণের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন প্রতিনিধি মাত্র ! এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

গণসত্তায় উত্তরণের মাধ্যমে আমরা ক্রমশ বুঝবো যে, আমার নিজের অস্তিত্ব নির্ভর করে অন্যের বেঁচে থাকার উপর। আমরা কেউই কারুর চেয়ে উপরে বা নিচে নই, সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে বৈরিতার কোনো চিহ্নও থাকবে না, ঠিক যেমন দেহের কোনও কোষের সঙ্গে অন্য কোষের শত্রুতা নেই। মনে রাখতে হবে, পায়ের পাতা, মাথার ব্রেন, বা দেহের অন্য যেকোনো অংশ একই কোষ দিয়ে তৈরি, তাই তাদের সমান গুরুত্ব। অথচ মানুষের মধ্যে এত হানাহানি, রেষারেষি অহরহ নজরে পড়ার কারণটির মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের অন্তহীন দুর্দশার মূল। সামান্য কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষীর চক্রান্তে স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের মধ্যে বাইরে থেকে উস্কানি দিয়ে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। 'বিভেদের মধ্যে ঐক্য' নামক রামধনু রঙের শ্লোগানটির নিচে ঢাকা পড়ে আছেন আসল মানুষ। তিনি উঠে এসে নিজের হাতে দেশের হাল ধরলেই প্রতিষ্ঠিত হবে গণসত্তা। এবং গণসত্তাই হল পৃথিবীর ভবিষ্যত।

এমন একটি সমাজব্যবস্থা এদেশের বুকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ম্যায় হী ভারত' নামক রাজনৈতিক দলটি গঠন করা হয়েছে। যেহেতু ভারতের সমস্ত মানুষ একই

পরিবারের সদস্য বলে আমরা নিশ্চিত, তাই আমাদের সামনে কোনোরকম বাধার অস্তিত্ব নেই, কারণ আমরা সবাই চাই দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি। আসুন, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। এদেশের, মানে আমাদের নিজেদের, ভবিষ্যৎ ঠিক তেমনটিই হবে যেমনটি আমরা চাইবো, কারণ আমরা, অর্থাৎ আমিই, ভারত।

।। ম্যায় হী ভারত ।।

২১শে আগস্ট, ২০১২
কলকাতা